সংবাদ

তারিখ ... 16 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২

শ্যামল কুমার সরকার

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। পেশাটি অন্য দশটি পেশার মতো নয়। শিক্ষকতা একটি ব্রত। বলা হয়ে থাকে এটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম মহৎ পেশা। আর যে কোন পেশার সঙ্গেই অর্থের সম্পর্ক আছে। কারণ পেশার মাধ্যমেই প্রত্যেক পেশাজীবীর জীবন-জীবিকা চলে। শিক্ষকরাও এর ব্যতিক্রম নন। শিক্ষকদের কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। শিক্ষকদের লোভ থাকবে না- আভিজাত্য থাকবে না- সাদামাটা জীবন থাকবে। এমন প্রত্যাশাই সমাজের। শিক্ষকরা সুদীর্ঘকাল ধরে সম্মানের সঙ্গেই সমাজে বাস করে আসছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বা স্বদেশী আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। এক্ষেত্রে মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা বিশেষ করে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণকারী শিক্ষকদের অবদান জাতি কোনদিন ভুলবে না। এক্ষেত্রে ড. এআর মল্লিক, ড. অজয় রায়, অধ্যাপক আলী আনোয়ার এবং ড. আনিসুজ্জামান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এর বাইরেও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে থাকেন। কখনো শিক্ষার্থীর গৃহে কখনো নিজ গৃহে। প্রাচীন গ্রিস, রোমেও এমন প্রচলন ছিল। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে গৃহ শিক্ষকতা ছিল। তবে তা আজকের বেপরোয়া অবস্থায় ছিল না। সে সময় শিক্ষকদের সম্মানী হিসেবে শিক্ষার্থীর পরিবার থেকে খাদ্যশস্য দেয়া হতো। কখনো কখনো রাজদরবার থেকে শিক্ষকদের জন্য কৃষিজমি বরাদ্দ করা হতো। সময় গড়িয়েছে- সভ্যতা এগিয়েছে। শিক্ষকরা এখন সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকৃত একটি পেশাজীবী গোষ্ঠী। রাষ্ট্র এখন শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিয়ে থাকে। যদিও সময়ের দাবি মেটাতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা মোটেও যথেষ্ট নয়। একবিংশ শতাব্দির চাকচিক্যময় সময়ে দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষক আর পূর্বসূরিদের সনাতনী মডেলে নিজেকে দেখতে চাচ্ছেন না। সেই ধূতি পাঞ্জাবি, পাজামা-পাঞ্জাবি, সেই ভারি কালো চশমা, ছাতা, লাঠি আর টর্চ হাতে আজকের শিক্ষকরা আর চলতে চাচ্ছেন না। বিশ্বায়নের উন্মত্ত হাওয়া শিক্ষকদেরও দোলা দিচ্ছে। ভোগবাদের মোহনীয় তাড়াকে শিক্ষকরা অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। আছে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দৌড়। আর সমস্যা সেখানেই। দরকার বাড়তি টাকা। দরকার দামি বাড়ি, দামি গাড়ি। দরকার ব্যাংক ব্যালেন্স। সবাই তো এভাবেই চলছে। শিক্ষকরা বসে থাকবেন কেন? তাদেরও তো মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা আছে। আছে আত্মীয়বর্গ। আছে প্রতিযোগিতা। কিন্তু শিক্ষকদের মনে থাকে না যে তারা শিক্ষক। তারা তো সমাজের অন্য ১০ জনের মতো নন। তাদের হতে হবে ব্যতিক্রম। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। কিন্তু একটি অংশের কারণেই শিক্ষক সমাজ আজ আর আগের সামাজিক মর্যাদায় আসীন নেই। শিক্ষকদের একটি অংশ আজ পথভ্রষ্ট-দিশেহারা। এরা ছুটছেন আর ছুটছেন। অর্থ আর আভিজাত্যই এই শ্রেণীর শিক্ষকদের একমাত্র লক্ষ্য।

এরা বিবেক-নীতির ধার না ধেরে শিক্ষকতাকে নিছক একটি অর্থকরী পেশা হিসেবে দেখছেন। ব্রত তাদের কাছে পুরোপুরি উপেক্ষিত। এরা মূলত ঠিকাদারের মতোই। আর তাই তো সরকারের এমন উদ্যোগ। সরকারের নজরে এসেছে দেশের সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক-শ্রেণীর শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছেন। এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন যা পরিবারের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকগণ হিমশিম খাচ্ছেন।

এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিং এ বেশি সময় ব্যয় করছেন। এর ফলে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ সম্পর্কিত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৭৩৬৬/২০১১ এর আদেশের প্রেক্ষিতে ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২ এর ক উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে অতিরিক্ত ক্লাস করা যাবে (অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে)। অনুচ্ছেদ ২ এর খ উপ-অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে অতিরিক্ত ক্লাসের ফি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ আছে মেট্রোপলিটন শহরে প্রতি বিষয়ে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/- (তিনশত) টাকা, জেলা শহরে ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০/- (একশ' পঞ্চাশ) টাকা রশিদের মাধ্যমে নেয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ক্লাসের নির্ধারিত ফি কমাতে বা মওকুফ করতে পারবেন। আরও উল্লেখ আছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত ক্লাসের ফি আদায় ও বণ্টন হবে। বলা আছে প্রতিষ্ঠানের পানি; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০% অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত ক্লাসের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কোন ক্রমেই এই খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। আরও উল্লেখ আছে একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২ (বার) টি ক্লাস এবং একটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখ আছে কোন শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে পারবেন না। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে দৈনিক বা প্রতিদিন অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে উক্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা (রোল-শ্রেণী উল্লেখসহ) দিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫ এ আছে কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং এ উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না।

৭ (সাত) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮ (আট) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

১২ অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদে মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে (সার্বিক) সভাপতি এবং মাউশির উপ-পরিচালককে (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল) সদস্য সচিব করে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। একই অনুচ্ছেদের (খ) উপ-অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (সার্বিক/শিক্ষা ও উন্নয়ন) সভাপতি এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে (সংশ্লিষ্ট) সদস্য সচিব করে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার একই অনুচ্ছেদের (গ) উপ-অনুচ্ছেদে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব কী? দায়িত্ব পালন না করা কি অন্যায় নয়? তাদের অন্যায় কি শাস্তিযোগ্য নয়?

১৩ (তের) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালার প্রয়োগ ও এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাস্তবে এমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

অনুচ্ছেদ ১৪ এর ক উপঅনুচ্ছেদে আইন অমান্যকারীদের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। এখানে বলা আছে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত, বাতিল, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিত করণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই অনুচ্ছেদের খ উপ-অনুচ্ছেদে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এমপিও বিহীন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিতসহ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই ধরনের শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ) অনুচ্ছেদের ঙ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ প্রয়োগ করা হবে।

আলোচিত বিধিসমূহ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ মোট ২৪টি স্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে নীতিমালা বাস্তবায়নে। ২০ জুন/২০১২ তারিখে জারিকৃত এ নীতিমালা কিছুদিন হৈচৈ ফেলেছিল। শিক্ষা ব্যবসায়ীরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে ছিল। এরপর আর তেমনভাবে পালিত হচ্ছে না। দেশের অনেক আইনের মতো এটিও তেমন কার্যকর হচ্ছে না। দেশে যৌতুকবিরোধী আইন আছে। তবুও যৌতুক আদান-প্রদান চলছে। কেউ অভিযোগ করছে না। কাজেই বিচারও সম্ভব হচ্ছে না। একই অবস্থা শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালারও। এক শ্রেণীর অভিভাবকের অতি উৎসাহের কারণে কিছু বিপথগামী শিক্ষক নিরাপদে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের যুক্তি- সরকারি ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারলে সরকারি বেতনভুক্ত শিক্ষকরা কেন প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না? এসব দেখার যেন কেউ নেই। এসব দেখ-ভালের জন্য তিনটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলেও ভুক্তভোগীরা কোন ফল পাচ্ছেন না। একজন অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে তার অসহায় অবস্থার কথা জানা গেছে। তার মতে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকেরা লিখিত অভিযোগ না করাতে তিনি কিছুই করতে পারছেন না। একাধিক অভিভাবকও তাদের কষ্টের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কমিটিগুলোর কি কিছুই করার নেই? এছাড়া অভিভাবকদেরও দায়িত্ব আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি এ ব্যাপারে দায় এড়াতে পারে না। শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে হবে। আইনের প্রয়োগ না হলে আইন করার দরকার কী? আইনটি কেন ৫ (পাঁচ) বছর ঘুমিয়ে আছে? সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এ কি শুধুই দায়সারা? লোক দেখানো? গত পাঁচ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেক। শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালাটিও দেশের বিবেকবান ও সচেতন মহলকে আলোড়িত করেছিল। ভুক্তভোগীরা ভেবেছিলেন এবার অন্তত শিক্ষক নামধারী কিছু সংখ্যক শিক্ষা-ব্যবসায়ীর নাগাল ধরা যাবে। দেশের বিবেকবান শিক্ষক, ভুক্তভোগী অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা ঠিকাদারি ধাঁচের এক শ্রেণীর শিক্ষক পদবীধারীদের লোভী থাবা থেকে মুক্তি চান। ভোগ সর্বস্ব জীবনযাপনে আগ্রহী ও অভ্যস্তদের কোনভাবেই শিক্ষকতার মতো পবিত্র পেশায় থাকার কোন সুযোগ নেই। পেশায় প্রবেশের আগেই এ ব্যাপারে ভাবা দরকার। সহজ-সরল-আড়ম্বরহীন-মানবসেবামূলক তথা অল্পতে তুষ্ট এবং আত্মতৃপ্তদেরই শিক্ষকতা পেশায় আসা এবং থাকা উচিত। এটাও সত্যি যে শিক্ষকদের বর্তমান বেতন কাঠামো মোটেও যথেষ্ট নয়। দ্রুত শিক্ষকদের জন্য আলাদা ও উচ্চতর বেতন কাঠামো ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি করা দরকার। এতে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য কমবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহের দুর্নীতি দমনসহ অন্যান্য পেশার দুর্নীতি দমনে সরকারকে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে। এতে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের প্রতিযোগিতার দৌড় কমবে। শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা-ব্যবসায়ীর দিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে। তা না হলে ওঝা-ফকিরেরা শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি করবে। পাশাপাশি আইনপ্রণেতাদের আইনের বাস্তবায়নের দিকে এখনই নজর দেয়া দরকার। মানসম্পন্ন শিক্ষা ও সৃজনশীল জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কালবিলম্বের কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগীরা অবিলম্বে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা দেখতে চান।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঝিটকা খাজা রহমত আলী ডিগ্রি কলেজ]